মূল মুদ্রণের পূর্বের কপি

প্রশিক্ষণ মডিউল

কমিউনিটি প্যারামেডিক-২০১৮

অষ্টমপত্র

সীমিত নিরাময়মূলক সেবা

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

প্রিন্ট: ২৪-০১-২০১৯

কমিউনিটি প্যারামেডিকদের

মৌলিক প্রশিক্ষণ

বিষয় : ৮

সীমিত নিরাময়মূলক সেবা

অধ্যায় ১ ঃ সীমিত নিরাময়মূলক সেবা

পাঠ-১	সীমিত নিরাময়মূলক সেবা	০৪
পাঠ-২	হাঁপানী/ শ্বাস কষ্ট	০৬
পাঠ-৩	সাপে কামড়ানো	০৯
পাঠ-৪	কুকুরে কামড়ানো	১১
পাঠ-৫	পানিতে ডোবা	১২
পাঠ-৬	বিষ খাওয়া	১৪
পাঠ-৭	পোড়া	১৬
পাঠ-৮	সড়ক দূর্ঘটনা	২০
পাঠ-৯	রক্তপাত	২২
পাঠ-১০	খুজলি-পাঁচড়া	২৪
পাঠ-১১	দাদ বা রিং ওয়ার্ম	২৪
পাঠ-১২	কনজাংটিভাইটিস	২৮
পাঠ-১৩	কান পাকা	৩০
পাঠ-১৪	প্রাথমিক চিকিৎসা	৩২
পাঠ-১৫	পর্যবেক্ষণ	৩৩
পাঠ-১৬	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৩৪
পাঠ-১৭	ব্যান্ডেজ	৩৫
পাঠ-১৮	হাড় ভাংগা	৩৭
পাঠ-১৯	খিচুঁনী	৩৯
পাঠ-২০	অজ্ঞান বা মূর্চ্ছা	৪১
পাঠ-২১	ব্যথা	৪৫

অধ্যায় ১: সীমিত নিরাময়মূলক সেবা

পাঠ-১
সীমিত নিরাময়মূলক সেবা

সীমিত নিরাময়মূলক সেবা হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা যা বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতি, যা ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে গ্রহণযোগ্য এবং যাতে পরিবার ও সমাজের সার্বজনীন ব্যবস্থা ও অধিকার এবং অংশগ্রহণ রয়েছে।

সীমিত নিরাময়মূলক সেবার অর্ন্তভূক্ত বিষয়সমূহ ঃ-

১. প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা যেমন- পানিতে ডোবা, সাপে কামড়ানো, কুকুরে কামড়ানো, ব্যথা, দুর্ঘটনা, পোড়া, অজ্ঞান হওয়া, শ্বাস কষ্ট, বিষক্রিয়া ইত্যাদি।
২. এ্যজমা বা হাঁপানী
৩. চর্মরোগ
৪. দাঁতের রোগসমূহ
৫. কানের রোগসমূহ
৬. চোখের রোগসমূহ
৭. সাধারন জ্বর ও ব্যথা

উদ্দেশ্য ঃ

১. উদ্বুদ্ধমূলক (Promotive) এই সেবার মূলে রয়েছে জনগনের জীবন ধারা সু-স্বাস্থ্যের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা যেমন
   - স্বাস্থ্য বিষয় সচেতনতা বাড়ানো
   - স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেয়ার জ্ঞান
   - সুষম পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে উৎসাহ প্রদান
   - স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও বাসস্থান এবং বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারে নিশ্চিত করণ।

২. প্রতিরোধমূলক সেবা (Preventive) শিশুদেরকে প্রতিষেধক টিকা দানের মাধ্যমে ১০টি মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষা করা।
   - প্রজনন ক্ষমতা সম্পন্ন মহিলাদেরকে ৫টি টিকা দানে মা ও নবজাতক শিশু উভয়কে ধনুষ্টংকার থেকে সুরক্ষা করা।
   - শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর মাধ্যমে রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করা।
   - গলগন্ড রোগ থেকে রক্ষা পেতে আয়োডিন যুক্ত লবন খেতে উদ্বুদ্ধ করা।

- ➢ মহিলাদের রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের জন্য আয়রন (ফলিক এসিড) এবং আয়রনযুক্ত খাবার খেতে উৎসাহিত করা।

৩. আরোগ্যমূলক সেবা (Curative) আরোগ্যমূলক সেবার মাধ্যমে রোগে আক্তান্ড় ব্যক্তিকে সময়মত সঠিক চিকিৎসা প্রদান এবং প্রয়োজনবোধে রেফার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. পূনর্বাসনমূলক সেবা (Rehabilitative) কোন রোগে বা আঘাতে পঙ্গু বা বিকলাঙ্গ হলে তাকে পূনর্বাসনে সচেষ্ট ও পদক্ষেপ নেওয়া।

পাঠ-২
হাঁপানী/ শ্বাস কষ্ট (Asthma)

হাঁপানী (Asthma) শ্বাসনালীর ভিতরে মিউকাস আবরনী প্রদাহ (Inflammation) জনিত রোগ যার ফলে শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগের সময় কষ্ট হয় এবং সাঁই সাঁই শব্দ করে। ফুসফুসে বাতাস প্রবেশের পর সংকুচিত হয় বলে এই অসুবিধা দেখা দেয়। হঠাৎ শ্বাস নালী সংকোচন বেশী হলে হাঁপানীর দেখা দেয়। কোন কোন সময় শ্বাসনালীর সংকোচন ধীরে ধীরে হয়।

কারণ (Causes) ঃ-

১. উত্তেজক বস্তু সমূহ যেমন ধূলাবালি, ফুলের রেনু
২. সুতা এবং পাট শিল্প
৩. বসন্ত কালে ঘাসে ঢাকা মাঠ, ধুলা, কুয়াশা
৪. পশুর লোম
৫. কার্পেট
৬. কাঁচা রং
৭. ধূলাবাহী পোকা মাকড়
৮. ঠান্ডা খাবার/ ঠান্ডা বা ঝাপসা আবহাওয়া
৯. ব্যথা নিরোধক ঔষধ/অন্যান্য কিছু ঔষধ
১০. ধূমপান
১১. কিছু এলার্জি জাতীয় খাদ্য- চিংড়ী, ইলিশ মাছ, মাংস ইত্যাদি

রোগ

- নিউমোনিয়া (Pneumonia)
- ফুসফুসে পানি জমলে (Hydrothorax)
- ফুসফুসে ফাইব্রোসিস (Lungs Fibrosis)
- এমপাকাইসেমা (Empysema)
- হার্ট ফেইলোর (Heart Failure)
- খুব বেশি মানসিক আবেগ বা উৎকণ্ঠা থাকলে।
- দীর্ঘদিন সর্দি কাশি থাকলে।

উপসর্গ ঃ

১. শ্বাস-কষ্ট (নিতে ও ফেলতে কষ্ট হবে)

২. তাৎক্ষনিক যদি পুরানো শ্বাস-কষ্ট বেড়ে যায় তাহলে সাঁই সাঁই শব্দ হবে
৩. কাশি ও সর্দিতে শ্বাস নিতে কষ্ট
৪. রাতে ঘুমানোর সময় কাশি বাড়বে
৫. দায়ী উত্তেজক বস্তুর কারণে শ্বাস-কষ্ট বেড়ে যাবে
৬. রাতে রোগীর ঘুম ভেংগে যাবে
৭. কথা বলতে কষ্ট হয়

লক্ষণ ঃ

১. রংকাই - চিকন বাশিঁর মত শব্দ (Ronchi)
২. হুইজ - সাঁই সাঁই শব্দ (Wheeze)
৩. রোগী অস্থির হয়ে যাবে (Restless)
৪. শ্বাস-কষ্টের কারণে হৃদরোগ হলে রোগীকে শোয়ালে তার শ্বাস-কষ্ট বেড়ে যাবে।
৫. নাড়ির গতি (Pulse), হৃদস্পন্দন হার্ট বিট, শ্বাস-প্রশ্বাস হার (Respiratory Rate) বেড়ে যাবে

প্রতিরোধ ঃ

১. মুক্ত বাতাসে থাকার চেষ্টা করা
২. দায়ী উত্তেজক খাদ্য ও বস্তু সংস্পর্শে আসলে হাঁপানী বেড়ে যায়, তা পরিহার করা
৩. ধুমপান বর্জন করা
৪. কাপড় পরিষ্কার করা
৫. বিছানা পত্র পরিষ্কার করা
৬. ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা
৭. এলার্জি সৃষ্ঠি করে এমন ঔষধ পরিহার করা

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ

১. রক্ত পরীক্ষা
২. চেষ্ট এক্স-রে (বুকের)
৩. ই.সি.জি
৪. স্কিন টেষ্ট

চিকিৎসা ঃ

১. শিশুদের জন্য :
    - সালবিউটামল সিরাপ
    - কিটোটিফেন সিরাপ

- এমাইনোফাইলিন সিরাপ
- থিওফাইলিন সিরাপ

২. বয়স্কদের জন্য

- মন্টেলুকাস টেবলেট
- সালবিউটামল টেবলেট
- কিটোটিফেন টেবলেট
- এমাইনোফাইলিন টেবলেট
- থিওফাইলিন টেবলেট

৩. মারাত্মক হলে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়।

৪. ইনহেলারঃ

- বর্তমানে ইনহেলার জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়।
- নেবুলাইজেশন

পাঠ-৩
সাপে কামড়ানো

উপসর্গ ও লক্ষণ ঃ

✓ বিষধর সাপ- ইহা সাধারনত ২টি বিষ দাঁতের চিহ্ন রেখে যায় (সব সময় না হতে পারে)

✓ বিষহীন সাপ- ইহা সাধারনত ২টির বেশি দাতেঁর চিহ্ন রেখে যায়।

- ✓ কামড়ের স্থানে ব্যথা
- ✓ ফুলে যাওয়া
- ✓ কামড়ের জায়গা থেকে রক্তক্ষরণ
- ✓ কামড়ের জায়গা থেকে চারিদিকে রং পরিবর্তন (কালো বা নীল) হয়।
- ✓ মাথা ব্যথা , মাথা ঘোরানো
- ✓ বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া
- ✓ ঘুম ঘুম ভাব
- ✓ কাটা স্থানে জ্বালা পোড়া করা
- ✓ মাংসপেশী অবশ হয়ে যাওয়া
- ✓ শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুও হতে পারে

প্রতিরোধ ঃ

১. সাপের কাছে যাওয়া যাবে না
২. ঘাস বা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে খুব সাবধানে হাটুন
৩. গর্তের মধ্যে হাত দিবেন না
৪. স্তুপাকৃত লাকড়ি অথবা খড় সাবধানে নাড়াচাড়া করুন
৫. মাচা ধরার সময় চাঁই বা জালের মধ্যে হাত দেয়ার আগে সাপ আছে কিনা দেখে নিন।
৬. রাতে হাটার সময় আলো সহ সাবধানে হাঁটুন
৭. রাতের বেলা বাইরে শোবার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

চিকিৎসা ঃ

১. রোগীকে সাহস প্রদান করতে হবে
২. কামড়ানো অঙ্গ নাড়াচড়া করা যাবে না
৩. আক্রান্ড় স্থান সাবান ও পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
৪. পায়ে দংশন করলে না হেঁটে বরং বসে পড়ুন। হাতে দংশন করলে হাত নাড়া-চাড়া করবেন না
৫. স্প্লিন্ট (Splint) দিয়ে ব্যান্ডেজ করুন
৬. দংশিত স্থানে কাটবেন না, সুই ফোটাবেন না, কিংবা কোন রকম প্রলেপ লাগাবেন না, চিরে বা চেপে রক্ত বের করবেন না।
৭. দংশিত স্থান ধুয়ে নিন ও ব্যান্ডেজ দিয়ে আবৃত করে রাখুন।
৮. রোগী দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।
৯. ওঝার চিকিৎসা নেওয়া যাবে না। তন্ত্র মন্ত্র ওঝার ঝাড় কোন বিষ নিরাময় করে না

১০. কথা বলতে অসুবিধা হলে, নাকে ব্যথা করলে কিংবা মুখে লালা ঝরলে রোগীকে কিছু খেতে দিবেন না।

১১. প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা রোগীর জীবন বিপন্ন করতে পারে।

পাঠ-৪
কুকুরে কামড়ানো

ভ্যাকসিন বিহীন কুকুরে কামড় দিলে র‍্যাবিস নামক রোগ হয়ে থাকে। র‍্যাবিস নামক ভাইরাস এ রোগের কারণ। সমগ্র বিশ্বে এ রোগের প্রাদুর্ভাব আছে। সাধারনত পাগলা ও নেড়ি কুকুর, বিড়াল ও বাদুড়, বেজি, শিয়াল ইত্যাদি বন্য প্রানীর লালায় ও জীবানু থাকে।

কুকুরে কামড়ালে যা জানা দরকার -

১. কুকুর টি রাস্ড়ার কি না

২. কামড়ানো কুকুর ও বিড়ালকে ১০দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৩. এ রোগের জীবণু সুপ্ত অবস্থায় কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস ও বৎসর পর্যন্ত থাকতে পারে।

৪. কুকুরটি পাগলা হওয়ার কোন লক্ষণ যেমনঃ ক্ষেপা স্বভাব, লালা ক্ষরণ, পানি ভয়, যাকে পায় তাকে কামড়ানো, ভাইরাস মুক্ত কুকুর হলে কুকুরটিকে মেরে ফেলতে হবে।
৫. সাধারন কামড়ানোর ১০ দিনের মধ্যে রোগ গ্রস্থ কুকুরটি মারা যায়।
৬. আহত ব্যক্তিকে দ্রুত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

উপসর্গঃ

১. পানি দেখলে ও পানির শব্দ পেলে ভয় পাওয়া
২. বিভ্রান্তি (Delusion), মতিভ্রম (Hallucination), আক্রোশ
৩. আক্রান্ত রোগী অন্য জনকে কামড় দেওয়ার প্রবণতা।
৪. মাঝে মাঝে উল্লাসিত ও চিন্তিত থাকে।

লক্ষণ ঃ

১. মস্তিস্কের আবরনীতে মেনিনজাইটিস এর লক্ষণ দেখা দিতে পারে
২. ক্ষত বা আঘাত
৩. অতিরিক্ত লালা পড়া
৪. চোখের পানি পাড়া

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

১. আক্রান্ত স্থানে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা।
২. কামড়ানোর সাথে সাথে প্রতিষেধক টিকা নিয়ে রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
৩. HDCV-Rabipul, verorum পাওয়া যায়। 0, 3, 7, 14, 28, ও 90 দিনে নিতে হয়।

পাঠ-৫
পানিতে ডোবা

পানিতে ডোবা ব্যাক্তি যখন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা চালায় তখন নাক, মুখ দিয়ে পাকস্থলী ও ফুসফুস পানি দিয়ে ভরে যায়, ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হওয়ার পর মাত্র ৪ মিনিট বেঁচে থাকতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রাথমিক পদক্ষেপ ঃ

পুকুর, জলাশয়ে ও নদীতে ডুবে গেলে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাপনা নিতে পারে।

১. নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, লম্বা কাঠি, বাশ, গাছের ডাল, দড়ি, পেচানো চাদর, জামা কাপড় ইত্যাদি যে কোন একটির এক প্রান্ত এক দিকে শক্ত করে ধরে অপর দিক ডুবন্ত ব্যক্তির কাছে ছুড়ে দিতে হবে। ডুবন্ত ব্যক্তি ধরার সাথে সাথে তাকে টেনে উপরে তুলতে হবে।

২. অল্প পানিতে ডুবে গেলে বা ডুবন্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে ভাসতে থাকলে উদ্ধার কারীর সাতার জানা থাকলে অতিদ্রুত ভাসমান ব্যাক্তির কাছে যেতে হবে। অল্প পানিতে ডুবলে তার কোমড় ধরে তুলতে হবে।

৩. মনে রাখতে হবে ডুবন্ত সচেতন ব্যক্তি যেন কোন অবস্থায় উদ্ধারকারীকে ঝাপটে ধরে রাখতে না পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

১. ডুবন্ত ব্যক্তিকে পানি থেকে উদ্ধার করে পেট থেকে পানি বের করার চেষ্টা না করে মাটিতে চিৎ করে শোয়ায়ে দিতে হবে।

২. ব্যাক্তিটির শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে আসলে সে বমি করে নিজে নিজে পেটের পানি বের করে দিবে। পানি বের হওয়ার সময় শ্বাস নালীতে ও ফুসফুসে আটকে না যায় জরুরী ভিত্তিতে শ্বাস-নালী পরিষ্কার করতে হবে।

৩. শ্বাস চালু হয়ে গেলে আরোগ্য অবস্থায় শুয়ায়ে দিতে হবে।

৪. মাথা তুলে ও পায়ে ধরে ঘুরানো উচিৎ নয়, যদি শ্বাস-প্রশ্বাস চালু না থাকে তবে মুখ থেকে মুখে বা মুখ থেকে নাকে জোরে ফুঁ দিতে হবে।

কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়া ঃ

১. রোগীকে চিৎ করে শোয়ান

২. রোগীর নাক বন্ধ করে রাখুন

৩. রোগীর মুখের উপর একটি রুমাল দিন

৪. এবার রোগীর মুখের উপর মুখ রাখুন

৫. এবার প্রচন্ড শ্বাস প্রয়োগ করুন যাতে বুক ফুলে উঠে

৬. এভাবে প্রতি মিনিটে ১৫ বার শ্বাস প্রয়োগ করুন।

কার্ডিয়াক ম্যাসেজ প্রক্রিয়া ঃ

১. রোগীকে চিৎ করে শোয়ান

২. বুকের নীচের দিকে এক হাতের তালু রাখুন

৩. উক্ত হাতের উপর অন্য হাতের তালু রাখুন

৪. এবার সোজাসোজি চাপ প্রয়োগ করুন, যাতে মোটামুটি দেড় ইঞ্চি বুক নীচের দিকে দেবে যায়।

৫. দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠান।

পাঠ-৬
বিষ খাওয়া (Poisoning)

মাত্রাতিরিক্ত কোন পদার্থ স্বেচ্ছায় বা ভুলবশতঃ সেবনে অসুস্থতা বা মৃত্যু হলে তাকে বিষক্রিয়া (Poisoning) বলা হয়। যেমন- কেরোসিন, পেট্রোল, ইঁদুর মারার বিষ, কীটনাশক ঔষধ, কাপড় ধোয়ার পাউডার, বিষাক্ত পাতা, বীজ বা ফল, মদ্যপান, ধুমপান অতিরিক্ত ঔষধ সেবন ও আসক্তি।

বিভিন্ন বিষের বোতল

বিষক্রিয়াকে দুইভাগে ভাগ করা যায় :

১. ধীরে ধীরে বিষক্রিয়া

২. দ্রুত বিষক্রিয়া

বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ ও চিহ্ন :

১. পেটে ব্যথা, বমি, খিচুনী, মুখে গন্ধ
২. মাথা ব্যথা , শ্বাস কষ্ট, তন্দ্রা
৩. শরীর নীল হয়ে যাওয়া
৪. শক ইত্যাদি।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

১. এসিড বা দাহ পদার্থ খেয়ে ফেললে জরুরী ভিত্তিতে আধা গ্লাস ঠান্ডা দুধ বা পানি খেতে দিতে হবে।
২. দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

দাহ্য পদার্থ ব্যতিত এমন কোন বিষাক্ত পদার্থ, পঁচা বাসি খাদ্য বা ভুল করে ও অতিরিক্ত ঔষধ খাওয়ার ফলে কোন ব্যক্তির দেহে বিষ ক্রিয়া হলে জরুরী ভিত্তিতে নিম্ন ব্যবস্থাপনা নিতে হবে-

১. মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি এসিড বা দাহ্য পদার্থ খেয়ে ফেললে তাকে বমি করানো যাবে না। বমি করালে তার খাদ্যনালী ও মুখ পুড়ে যাবে। Stomach wash করা যাবে না।

২. অজ্ঞান ব্যাক্তির ক্ষেত্রে

ক) শ্বাস নালী মুখে দিতে হবে, শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে হবে।

খ) শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মুখে মুখে বা মুখ থেকে নাকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে।

গ) শ্বাস-প্রশ্বাস চালু হলে ব্যক্তিকে শোয়ায়ে দিতে হবে এবং দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ) বিষ খাওয়া রোগীকে উপুর বা কাত করে শোয়াতে হবে।

ঙ) সম্ভব হলে I/v fluid দিতে হবে।

চ) সজ্ঞান ব্যক্তির ক্ষেত্রে-

- ব্যক্তিটির গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করাতে হবে। ১৫ মিনিট পর ২য় বার আবার বমি করাতে হবে।
- বমি করানোর পর ব্যক্তিটিকে প্রচুর পরিমান ঠান্ডা পানি পান করাতে হবে।
- ডাক্তার বা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে।

পাঠ-৭

পোড়া (Burn)

শরীরের ত্বক উত্তপ্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাকে পোড়া বলে। শরীরের ত্বকে তরল জাতীয় গরম বস্তু যেমন গরম তেল, ফুটন্ত পানি দিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে তাকে Scald বলে।

পোড়ার স্তর ঃ

১। প্রথম ডিগ্রি: চামড়ার প্রদাহ

২। দ্বিতীয় ডিগ্রি: অগভীর প্রদাহ

৩। তৃতীয় ডিগ্রি: গভীর প্রদাহ

লক্ষণ ও চিহ্ন :

প্রথম ডিগ্রি আক্রান্ত স্থানে শুধু লালচে বর্ণ ধারন করে । জ্বালাপোড়া বা অল্প ব্যথা হতে পরে।

দ্বিতীয় ডিগ্রি: আক্রান্ত স্থানে পানি যুক্ত ফোসকা পড়ে। একটি বড় ফোসকা বা একাধিক ছোট ছোট ফোসকা থাকতে পারে। জ্বালাপোড়া ব্যাথা এবং জ্বর হতে পারে। শিশুরা ব্যাথায় চিৎকার করতে থাকে এবং অস্থির হয়ে পড়ে।

তৃতীয় ডিগ্রি: চামড়া ঝলসে গিয়ে কাঁচা অথবা পোড়া মাংস বেরিয়ে আসে। রোগীরা জ্বালা - যন্ত্রনা ও ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে। রোগীরা হঠাৎ করে শক এ চলে যেতে পারে।

জটিলতা :

১ম ও ২য় ডিগ্রি পোড়াতে সাধারণত কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না কিন্তু ৩য় ডিগ্রি পোড়ার ক্ষেত্রে সুচিকিৎসা গ্রহণ করার পরও কিছু শারীরিক বিকৃতি থেকেই যায় যার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে আরো জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এছাড়া যে সকল জটিলতা তাৎক্ষনিকভাবে দেখা দেয়া সেগুলো হলো-

- শরীরের পানি জাতীয় পদার্থ কমে যাওয়া, প্রচন্ড যন্ত্রণা এবং জ্বরের কারণে শক হতে পারে।
- অনেকটা স্থানের চামড়া পুড়ে যাওয়ায় ধনুষ্টংকারসহ সব ধরনের সংক্রামণের জন্য টিস্যু উম্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং তা প্রাণঘাতী হতে পারে।
- ক্ষতস্থানের টিস্যু সংঙ্কুচিত হওয়ার ফলে সংকোচন দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা :

সকল পর্যায়ের পোড়া রোগীকে অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা সমূহ হলো যথাক্রমে-

- পানি দিয়ে ক্ষতস্থানটুকু ঠান্ডা রাখতে হবে যাতে টিস্যুর আরও ক্ষতি না হতে পারে
- এ প্রক্রিয়াটুকু অন্তত পক্ষে ১৫ মিনিট ধরে চালু রাখতে হবে।
- ব্যথা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় প্যারাসিটামল দিতে হবে। তারপর পোড়ার ডিগ্রি হিসাবে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।
- শরীরের পোড়া ১৫% চামড়ার বেশি (শিশুদের ক্ষেত্রে ১০%) হলে শরীরে স্যালাইন বা প্লাজমা দিতে হবে।

১ম ডিগ্রি পোড়া :

- রোগীকে বা তার অভিভাবককে আশ্বস্থ করতে হবে এই বলে যে, এ পর্যায়ে আর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

২য় ডিগ্রি পোড়া :

ফোসকা ফাটানো যাবে না কারণ এর ফলে রোগ সংক্রামকণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

- কোনভাবে যদি ফোসকা ফেটে যায় তবে সাবান ও ঠান্ডা পানি দিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে দিতে হবে এবং বেটাডিন অথবা সিলভার সালফাডায়জিন মলম হাল্কা করে লাগাতে হবে।
- ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল মাত্রা অনুযায়ী দিতে হবে।
- কোন প্রকার ড্রেসিং করা যাবে না।

৩য় ডিগ্রি পোড়া :

প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পর রোগীকে অবশ্যই নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা জেলা সদর হাসপাতাল অথবা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে। এর পূর্বে সম্ভব হলে রোগীকে একটি টিটি ইনজেকশন এবং প্রয়োজনে টিআইজি ইনজেকশন দিয়ে দিলে ভালো হয়।

পরামর্শ ও প্রতিরোধ :

- বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিশুদেরকে পোড়ার শিকার হতে হয় মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে হলে শিশুদের মা-বাবাকে স্বাস্থ্য শিক্ষা দেয়া অবশ্য প্রয়োজন

  - ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে খোলা আগুন কিংবা কয়লার চুলার কাছে অথবা ছিটকে পড়তে পারে এমন কোন গরম তরল পদার্থের কাছে থাকতে দেয়া যাবে ন।

  - পাত্রের হাতল চুলার উপর এমন ভাবে ঘুরিয়ে রাখতে হবে যেন তা শিশুদের নাগালের বাইরে থাকে।

  - বাতি, ম্যাচ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি শিশুর নাগালের বাইরে রাখতে হবে।
- মৃগী রোগীদেরকে রান্না-বান্নার কোন কাজ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তাদেরকে আগুনের কাছে যেতে দেওয়া উচিত নায়।
- কুষ্ঠ রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা দ্বারা সারিয়ে তুলতে হবে। রোগে আক্রান্ত অবস্থায় তাদের কাছে গরম কোন জিনিস আনা অথবা তাদেরকে পুড়ে যেতে পারে যেতে পারে এমন কোন উৎসের কাছে নেয়া উচিত না।
- এসিড নিক্ষেপকারীকে কঠোরতম শাস্তি প্রদানের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে হবে। কোন দোকান থেকে যততত্র এসিড বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে।

উপদেশ ঃ

- পোড়া রোগীরে ক্ষেত্রে টোটকা চিকিৎসা না করে ডাক্তারি মতে চিকিৎসা করা উচিত
- ফোসকা পড়ে গেলে তা ফাটানো উচিত নয়
- রোগীকে স্বাভাবিক খাবার খেতে দেয়া উচিত এবং শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা উচিত নয়।

রেফার করা :

নিম্ন লিখিত অবস্থায় রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

- রোগী মারাত্মকভাবে পুড়ে গেলে এবং সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ অংশ ২% এর বেশি হলে (রোগীর দুই হাতের তালুর সমান অংশ)
- মাথা, ঘাড়, শ্বাস-পথ, চোখ, গ্রন্থি অথবা জননেন্দ্রিয় পুড়ে গেল
- চামড়া পুড়ে ভেতরের টিস্যু আক্রান্ড় হয়ে থাকলে (যেমন- মাংসপেশি, চর্বি, হাড় ও মাংসপেশির সংযোগকারী শিরাগুচ্ছু ইত্যাদি)

মনে রাখা উচিত :

- সকল পর্যায়ের পোড়া রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা
- ৩য় ডিগ্রি পোড়া রোগীকে টিটি বা টিআইজি ইনজেকশন দেওয়া
- ৩য় ডিগ্রি পোড়া রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ
- শিশুদের, মৃগী রোগীদের ও কুষ্ঠ রোগীদের আগুন থেকে দূরে রাখা।

পাঠ-৮
সড়ক দূর্ঘটনা

রাস্ত-ঘাটে চলাকালীন সময়ে অসকর্তা বা অসাবধানতা বা দৈবক্রমে যে দূর্ঘটনা ঘটে তাকে সড়ক দূর্ঘটনা বলে।

কারণ সমূহ ঃ

১. অসতর্ক ভাবে চলাফেরা করা
২. ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা
৩. গাড়ী-চালকের অদক্ষতা ও অজ্ঞতা
৪. মেয়াদত্তীর্ন ও ক্রটিপূর্ন যানবাহন চালনা করা
৫. রাস্তা-ঘাটের দূরাবস্থা
৬. ট্রাফিক আইন না মানার প্রবনতা
৭. গাড়ী চালকদের অযথা প্রতিযোগীতা মূলক আচরন
৮. রাস্তা পাড়াপাড়ের সময় সাবধানতা অবলম্বন কর
৯. কানে এয়ারফোন বা মোবাইল ব্যবহার করে রাস্তা পাড়াপাড়
১০. গাড়ী চালক ....চলন্ত গাড়ীতে মোবাইলে কথা বলা

পরিণতি ঃ

১. রক্তক্ষরণ সামন্য বা প্রচুর রক্তক্ষরণ
২. হাড় ভাংগা
৩. শরীরে কোন কিছু প্রবেশ করা
৪. শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হওয়া
৫. শক (Hypovolaemic Shock)
৬. মূর্ছা
৭. মানসিক আঘাত
৮. পঙ্গু
৯. মৃত্যুও হতে পারে।

ব্যবস্থাপনা ঃ

স্বল্প আঘাতে ব্যবস্থাপনা

১. শরীরের কোন অংশ সামান্য কেটে গেলে Abrasion হয়ে গেলে আক্রান্ত জায়গায় পরিষ্কার পানি দিয়ে পরিষ্কার করে এন্টিসেপটিক দিতে হবে।
২. Dressing করতে হবে।

আঘাত বেশী হলে

১. পরিষ্কার করে সেলাই দিতে হবে।
২. মাথায় আঘাত স্বল্প হলে পরিষ্কার করে সেলাই দিয়ে Dressing করতে হবে।
৩. মাথায় বেশী আঘাত হলে রক্তক্ষরন বেশী হলে শিরাপথে স্যালাইন দিয়ে যত দ্রুত হাসপাতালে প্রেরন করতে হবে।

মনে রাখা উচিত -
সতর্কতা ও সচেতনাই জীবন রক্ষা করার মূল মন্ত্র।
ক্ষণিকের অসাবধনতা সারা জীবনের কান্না।

পাঠ-৯

রক্তপাত (**Haemorrhage/Bleeding**)

শরীরের কোন স্থান হতে অস্বাভাবিক ভাবে অর্থাৎ আঘাত, রোগ বা অন্য যে কোন কারণে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

প্রকারভেদ ঃ

১. বাহ্যিক রক্তক্ষরণ (External Bleeding)

২. অভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ (Internal Bleeding)

রক্তপাতের ক্ষেত্রে বিপদজনক অবস্থা ঃ

নিম্নলিখিত অবস্থা আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মারাত্মক বিপদজনক।

- প্রচুর রক্তপাত হলে অথবা ক্ষতস্থান ১০-১৫ মিনিট চেপে ধরে রাখার পরও রক্তপাত বন্ধ না হলে
- প্রচন্ড ব্যথা হলে, আহত ব্যাক্তির শক হলে অর্থাৎ তার চেহারা ফ্যাকাসে হলে, শরীর ঠান্ডা ও স্যাত সেতে হলে, খুব দুর্বল হয়ে পড়লে বা শরীরে খিচুনী দেখা দিলে
- আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির ঘুম ঘুম ভাব হলে বা সে অজ্ঞান হয়ে গেলে
- গর্ভবতী মহিলার যোনীপথে কোন প্রকার রক্তপাত হলে
- মাথায় আঘাত জনিত করনে শক, কান বা বমির সাথে রক্ত বের হলে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

১. আহত স্থান উচু করে ধরতে হবে।

২. পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরতে হবে। কাপড় না থাকলে পরিষ্কার হাত দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত রক্ত পড়া না থামে ততক্ষন চেপে রাখতে হবে।

৩. যদি চেপে রাখার পরেও কোন ভাবেই রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তবে নিম্নরূপঃ

- ক্ষতস্থানে প্রেসার ব্যান্ডেজ দিতে হবে।
- ক্ষতস্থান যতদুর সম্ভব উঁচু করে রাখতে হবে।
- আক্রান্ত অঙ্গ নাড়াচড়া করা যাবে না।

৪. রক্তক্ষরণ বেশী হয়ে যাতে রোগী শকে না যায় সেজন্য পায়ের দিক উচু ও মাথার দিক নিচু করে রাখতে হবে।

৫. রক্তপাত যদি শীঘ্রই বন্ধ না হয়, তাহলে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

৬. I/v fluid দিতে হবে।

পাঠ-১০

খুজলি-পাঁচড়া (Scabies)

খুজলি-পাঁচড়া (Scabies) একটি সংক্রামক রোগ। ইহা সাধারনত শরীরের হাতের দুই আঙ্গুলের মাঝে, নিতম্বে, যৌনাঙ্গে, জয়েন্টের ভাজে এবং পরে সমস্ত শরীরে দেখা যায়। এই রোগে রাতে চুলকানী বেশী হয়।

কারণ ঃ

১. আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শ

২. উপযুক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভাব

৩. দৈনন্দিন কাজে অপরিস্কার পানির ব্যবহার ও নদী/পুকুরের দুষিত পানি ব্যবহার

৪. অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা

৫. ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিছন্নতার অভাব (নিয়মিত গোসল না করলে/ নোংরা কাপড় ব্যবহার করলে)

৬. আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় ব্যবহার।

লক্ষণ/চিহ্ন ঃ

১. চুলকানী (Itching) রাতে বেশী হবে

২. চুলকানীর পর ব্যথা অনুভব হবে।

৩. শরীরের বিভিন্ন ভাজে বেশি দেখা যাবে।

চিহ্ন ঃ

১. হাতে ও শরীরে ফুসকুড়ি দেখা যায়

২. চুলকানীর দাগ পাওয়া যায়

৩. চুলকানী গুলো পুঁজ যুক্ত হয়

চিকিৎসা ঃ

১. ইহা একটি পারিবারিক রোগ। সবাইকে একসাথে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

২. ২৫% বেনজাইল বেনজয়েট মিশ্রণ পর পর তিন দিন ব্যবহার করতে হবে

৩. তিনদিন পর ব্যবহার্য্য কাপড়, কাথা, বালিশ গরম পানি দিয়ে ধুতে হবে

৪. সংক্রমণ হলে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে। e.g; Penicillin, Amoxicillin, Cotrimoxazde, Cefradin.

৫. তীব্র চুলকানী ও ব্যথা হলে এন্টিহিসটামিন ও ব্যথা নাশক ঔষধ প্যারাসিটামল দিতে হবে।

৬. নিমপাতা ব্যবহারেও উপকার পাওয়া যায় ।

৭. পরিবারের সকলের চিকিৎসা এক সঙ্গে করতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ

১. খুজঁলি একটি পারিবারিক রোগ, তাই পরিবারের সবাইকে চিকিৎসা নিতে হবে এবং সচেতন হতে হবে।

২. খুজঁলির বেলায় রোগীকে অন্যদের কাছ থেকে আলাদা রাখতে হবে।
৩. পরিবারের সব সদস্যদের জামা কাপড়, বিছানার চাদর, গামছা এবং তোয়ালে সোডা বা সাবান লাগিয়ে সিদ্ধ করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
৪. প্রতিদিন গোসল করিয়ে রোগীকে পরিস্কার রাখতে হবে
৫. মাঝে মাঝে পরিধানের কাপড় পরিবর্তন করতে হবে
৬. বিছানার চাদর, বালিশের খোল মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হবে
৭. নখ কাটতে হবে ও পরিষ্কার করতে হবে

জটিলতা ঃ

১. একিউট গ্লোমেরুলো নেফ্রাইটিস
২. নেফ্রোটিক সিনড্রোম

পাঠ-১১
দাদ বা রিং ওয়ার্ম

ত্বকে ছোট ছোট গোলাকার দাগ দেখা যায় যা আস্তে আস্তে বড় হয় এবং চুলকায়। মাথা থেকে থোকা থোকা চুল পড়ে যায়। নখ নোংরা হলে রোগ ছড়ায়। এই ঘা দেখতে গোলাকৃতি রিং এর মত। চারিপার্শ্বের ধার পানি ভর্তি ছোট ছোট ফুসকুড়িতে উচু হয়ে থাকতে দেখা যায়। এই ধরনের ঘা দেখা দিলে তাকে দাদ বলে।

কারণ ঃ

১. ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিছন্নতার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব
২. পরিবারের কারও দাদ থাকলে এবং সেই কাপড় ব্যবহার করলে
৩. অন্যের কাপড় পরায় অভ্যাস থাকলে
৪. পারিপার্শ্বিক পরিছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষার অভাব
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনার অভাব।

ধরণ ঃ

- Taenia pedis আঙ্গুলের ফাঁকে হয়
- Taenia Corpores শরীরে হয়

- Taenia Capitis মাথায় হয়
- Taenia Cruris- কুচকি ও যৌনাঙ্গে হয়।
- Taenia Ungium- নখে হয়।

লক্ষণ ঃ

১. শরীরে যে কোন জায়গায় দেখা যায়
২. দীর্ঘ মেয়াদী হলে ও মরনঘাতী রোগ থাকলে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।
৩. চুলকানী থাকে
৪. ব্যথা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে
৫. ঘা থাকবে ফুসকুড়ির মত
৬. অনেক সময় মাথায় হলে চুল থাকে না।

চিহ্ন ঃ

১. চামড়ার উপর আংটির (Ring) মত গোলাকার ক্ষতের সৃষ্টি হয়। গোলাকার এর মধ্যখানে মসৃণ দেখায়, চারিদিকে পানি ভর্তি ফুসকুড়ি ও কিনারাগুলো উচু থাকে ও কখনো কখনো পানি ভর্তি ও পুজ ভর্তি দানা হয়। নখে হলে অস্বচ্ছ ও ভঙ্গুর হয়ে যায়।

চিকিৎসা ঃ

১. Unguentum wheatfield দিয়ে ২ বার ১৫ দিন
২. Clotrimazole Cream দিয়ে ২ বার ১৫ দিন
৩. Ticonazole 1% দিনে ২ বার ১৫ দিন
৪. Econazole দিনে ২ বার ১৫ দিন থেকে ১মাস
৫. Miconazole দিনে ২ বার ১৫ দিন থেকে ১মাস
৬. Cap. Fluconazole 50 mg ১ মাস কিন্তু গর্ভবতী ও প্রসূতি মা-দেরকে দেয়া যাবে না
৭. Cap. Etraconazole 100 mg ১৫ দিন-১ মাস
৮. Ketoconazole
৯. নখে হলে ২-৬ মাস পর্যন্ত ঔষধ খেতে হয়।

প্রতিরোধ ঃ

১. প্রতিদিন ভালভাবে ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার করা
২. দাদ আক্রান্ত রোগীর কাপড় ব্যবহার না করা

৩. স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন হওয়া

৪. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন থাকা

পাঠ-১২

কনজাংটিভাইটিস

চোখের ভিতরে এবং চোখের শ্লেষা আবরনীতে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোন ফরেন বডির করণে প্রদাহে লাল হয়ে যাওয়াকে কনজাংটিভাইটিস বলে। সাধারনত ভাইরাস জনিত কনজাংটিভাইটিস বেশী দেখা যায়। হইা খুব দ্রুত ছড়ায়।

কারণ ঃ

১. চোখ উঠা আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করলে

২. দুষিত পানি চোখে ঢুকলে ব্যাকটেরিয়া জনিত করনে চোখ উঠে

৩. Chemical বা অন্য কোন বস্তু চোখে পড়লে। যেমনঃ Savlon

৪. ভাইরাস, ব্যাকটরিয়া এলার্জি

৫. চোখে আঘাতের কারণে

৬. বিষাক্ত তরল পদার্থ কিংবা পাউডার চোখে গেলে

লক্ষণ/চিহ্ন ঃ

১. চোখ লাল হয়ে যাওয়া

২. চোখ থেকে নরম পুজঁ নির্গত হওয়া

৩. চোখের পাতা ফুলে যাওয়া

৪. ব্যথা করা

৫. পানি পড়া

৬. শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া

৭. আলোর দিকে তাকাতে না পারা

চিকিৎসা ঃ

১. সাধারণত ভাইরাস জনিত কনজাংটিভাইটিস এ ঔষধ লাগে না। চোখ পরিস্কার রাখতে হবে। মারাত্মক হলে, ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

২. ব্যাকটেরিয়া জনিত কনজাংটিভাইটিস হলে এন্টিবায়োটিক মলম ও চোখের ড্রপ ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ

১. রোগীকে এবং রোগী শিশু হলে তার পিতামাতাকে চোখ পরিষ্কার করা এবং প্রয়োজনে ড্রপ ব্যবহারের পদ্ধতি শিখাতে হবে।

২. পরিবারের প্রত্যেকের হাত, মুখ, মুছার জন্য আলাদা গামছা, তোয়ালে, রুমাল অথবা পরিস্কার কাপড় ব্যবহার করতে হবে

৩. মুখ, হাত পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার পানি অবশ্যই করতে হবে

৪. রাসায়নিক পদার্থ, ধুলা-বালি, আবর্জনা, নোংড়া পানি বা ধারালো খেলনা দিয়ে শিশুদের খেলতে দেয়া যাবে না ।

৫. যে সমস্ত জিনিসে এলার্জি হয় তা পরিহার করতে হবে

৬. রোদ প্রতিরোধের জন্য চশমা ব্যবহার করবেন ।

পাঠ-১৩
কান পাকা

কানে সংক্রমণ হলে কান থেকে পুজঁ বা পানি জাতীয় পদার্থ নির্গত হলে সাধারণত আমরা কান পাকা বলে থাকি। শিশুদের এটি একটি সাধারন রোগ। তবে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের লোকেরা এ রোগে ভুগতে পারে। শহরাঞ্চলে এ রোগের প্রকোপ কম। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ও নদীর তীরে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

কারণ ঃ

১.উর্দ্বশ্বাস নালীর সংক্রমণ

২.গোসলের সময় যদি দূষিত পানি কানের ভিতর ঢুকে

৩.রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল থাকাতে শিশুরা সহজে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৪.কোন শক্ত ধরনের জীবাণু দূষন জিনিস দিয়ে কান চুলকানোর অভ্যাস। যেমন, কাঠি,সেপটিপিন, পাখির পালক।

৫.অনেক সময় বাচ্চাকে শোয়ানো অবস্থায় অসাবধানতার সহিত বুকের দুধ খাওয়ালে বাচ্চার কানের ভিতর বুকের দুধ ঢুকে যেতে পারে।

৬.শিশুদের দাঁত উঠার সময় কানে প্রদাহ

৭.শিশুদের সংক্রামক ব্যাধি যেমন, হাম, জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা

৮.টনসিলের ও এডিনয়েডের দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারনে কান পাকা রোগ হয়।

৯.বয়স্কদের কান পাকা রোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শৈশবের দীর্ঘস্থায়ী কানের প্রদাহের কারণে হয়ে থাকে।

লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ

১. কান দিয়ে পুঁজ বা পানি নির্গত হয়।

২. দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নির্গত হয়।

৩. কান ভার ভার ও তালি লাগতে পারে।

৪. শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

৫. সংক্রমণ থাকলে কানে শুনতে অসুবিধা বোধ করতে পারে।

৬. কানে ব্যথা, কানের আশে পাশে গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে।

৭. মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

১. এন্টিবায়োটিক কানের নিঃসরনের অবস্থা অনুযায়ী ।

২. কানের ভিতরে স্থানীয় ভাবে ফোঁটা জাতীয় এন্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রতিরোধ ঃ-

১. কোন অবস্থায় কানে যাতে পানি না ঢুকে।

২. ময়লা কাঠি, বা আঙ্গুল দিয়ে কান না খুচানো

৩. Cotton bud কটন বাড -এ নরম কাপড় পেচিয়ে কানে ব্যবহার করতে হবে।

৪. ময়লা পানিতে ডুব দিয়ে গোসল করা যাবে না ।

৫. শিশুদেরকে বসিয়ে তরল খাদ্য খাওয়াতে হবে।

৬. শিশুদেরকে ঠান্ডা লাগানো যাবে না।

৭. যে কোন জটিলতা দেখা দিলে হাসপাতালে রেফার করতে হবে।

জটিলতা ঃ

১. বধিরতা- শ্রবন শক্তি হারালে তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব ।

২. কানের আশে পাশে ফোঁড়া

৩. মুখের এক পাশ অবশ হয়ে যাওয়া

৪. অন্তঃকর্নের প্রদাহ

৫. মস্তিষ্কে ফোঁড়া

৬. চলাফেরার অসুবিধা বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।

পাঠ-১৪

প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

চিকিৎসা সেবার পরিভাষায় আহত, অসুস্থ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবার জন্যে চিকিৎসক/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্বে জরুরী যে সেবা দেয়া হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য ঃ

১. আহত/অসুস্থ ব্যক্তির জীবন বাচাঁতে সাহায্য করা

২. অবস্থার অবনতি রোধে সহায়তা করা।

প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব ঃ

১. রোগীর জীবন রক্ষা পায়

২. সংক্রমণের হার কম হয়

৩. রোগীর হাসপাতালে অবস্থান কালীন সময় কমায়

৪. রোগীর জটিলতা কম হয়

৫. রোগী তাড়াতাড়ি আরোগ্যের পথে আসে।

পাঠ-১৫

পর্যবেক্ষণ (Observation)

যে কোন আহত/অসুস্থ ব্যক্তিকে ধীর-স্থিরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামই পর্যবেক্ষণ।

পর্যবেক্ষণ দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

১. প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ বা জরুরী পর্যবেক্ষণ, যা থেকে জানা যায় আহত/অসুস্থ ব্যক্তিটি জীবিত বা মৃত।

২. পরবর্তী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় আহত/অসুস্থ ব্যক্তির বর্তমান অবস্থা কি।

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ ঃ

ABCDE এই ৫টি বিষয় প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের বিষয়গুলো সহজে মনে রাখা যায়।

A = Airway বা শ্বাসনালী

B = Breathing বা শ্বাস-প্রশ্বাস

C = Circulation of Blood বা রক্ত পরিসঞ্চালন।

D= Disable

E= Environmental Care

পরবর্তী পর্যবেক্ষণ ঃ

প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পরে দেখতে হবে আহত বা অসুস্থ ব্যক্তি-

- ✓ অজ্ঞান হয়ে গেছে কি না
- ✓ মাথায় বা মেরুদন্ডে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছে কি না
- ✓ কোথাও হাড় ভেংগে গেছে কি না
- ✓ বিষক্রিয়া হয়েছে কি না
- ✓ সাপে কেটেছে কি না
- ✓ মারাত্মক ভাবে পুড়ে গেছে কি না
- ✓ রক্তক্ষরণ হচ্ছে কি না

পাঠ-১৬
প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা যা বাস্তব ভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত, পদ্ধতি প্রযুক্তিতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং যাতে সমাজের সবাই তথা সকল পরিবারের সার্বজনীন অধিকার ও অংশগ্রহণ রয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদানগুলো হচ্ছে-

১. স্বাস্থ্য শিক্ষা
২. খাদ্য ও পুষ্টি
৩. নিরাপদ পানি, মৌলিক পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিস্কাশন
৪. মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা
৫. সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকাদান
৬. স্থানীয় রোগ সমূহের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন
৭. সাধারন রোগ ও আঘাতের যথাযথ চিকিৎসা
৮. অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের ব্যবস্থা।

পাঠ-১৭
ব্যান্ডেজ

ক্ষতস্থানকে ঢেকে রাখার জন্য বা ভাংগা হাড় যথাস্থানে ধরে রাখার জন্য যে কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করা হয়, তাকে ব্যান্ডেজ বলে।

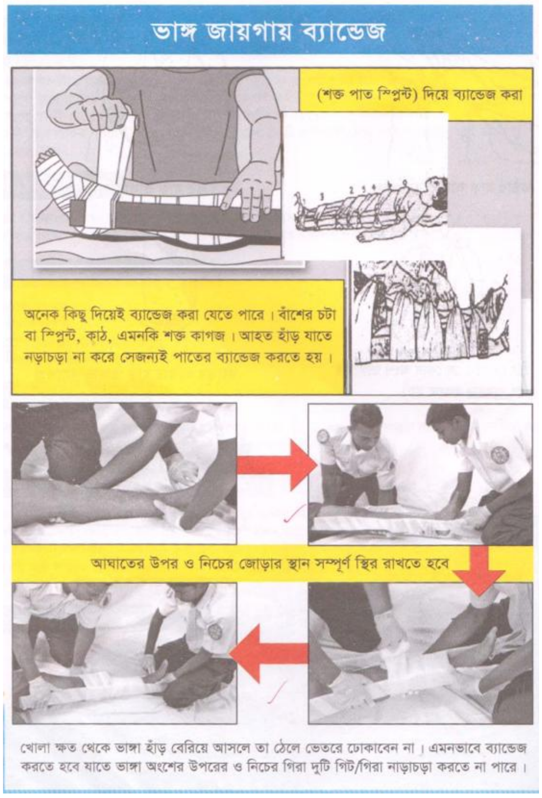

ব্যান্ডেজের গুরুত্ব ঃ

১. পরিষ্কার কাপড় বা গজ ক্ষতস্থানকে ঢেকে রাখে

২. ভাংগা বা আহত স্থানে Splint ধরে রাখার জন্য যাতে ভাংগা হাড় নড়ে চড়ে না যায়

৩. রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য টুরনিকোয়েট হিসেবে ব্যবহার করে রক্ত বন্ধ করা

৪. আহত স্থানকে ঝুলিয়ে রাখা যায় (Sling)

৫. ব্যান্ডেজ ড্রেসিংটাকে পুরা ঢেকে রাখে

ব্যান্ডেজ ব্যবহারে নিয়ম ঃ

১. ব্যান্ডেজ অতি আলগা বা অতি জোরে যেন না লাগে। ব্যান্ডেজ অতি জোরে লাগলে শিরা উপশিরা দিয়ে রক্ত চলাচলের ব্যঘাত ঘটতে পারে।

২. ব্যবহৃত কোন ব্যান্ডেজ ভিজে গেলে কিংবা তার নিচে নোংরা লেগে গেলে ব্যান্ডেজটি সরিয়ে নিন, ক্ষত স্থান আবার পরিস্কার করুন এবং একটি পরিস্কার ব্যান্ডেজ লাগান।

৩. ব্যান্ডেজ জীবাণু মুক্ত হতে হবে।

৪. একবার ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না।

পাঠ-১৮

হাড় ভাংগা (Fracture)

আঘাতে যদি দেহের কোন হাড় ফেটে বা ভেংগে যায় তাকে হাড় ভাংগা বা Fracture বলা হয়।

হাড় ভাংগার শ্রেণী বিভাগ ঃ

হাড় ভাংগাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

১. সাধারন (Simple) অথবা বন্ধ (Closed) হাড় ভাংগা ঃ- যেখানে হাড় ভাংগার ফলে কেবল অন্তঃস্থ ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এখানে হাড়, ত্বক ভেদ করে বাইরে আসে না।

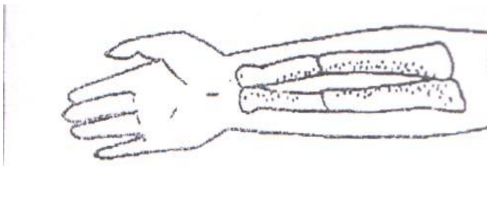

২. কম্পাউন্ড (Compound) বা উন্মুক্ত (Open) হাড় ভাংগা ঃ- যেখানে হাড় ভাংগার ফলে অন্তঃস্থ ক্ষত ছাড়াও ত্বক ভেদ করে হাড়ের প্রান্ত খোলা বাতাসে বেরিয়ে আসে।

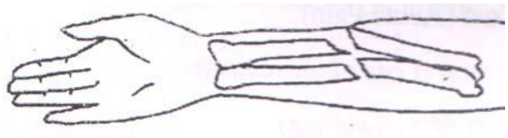

৩. কমপ্লিকেটেড (Complicated) বা জটিল হাড় ভাংগাঃ- যেখানে হাড় ভেংগে গিয়ে কয়েক খন্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

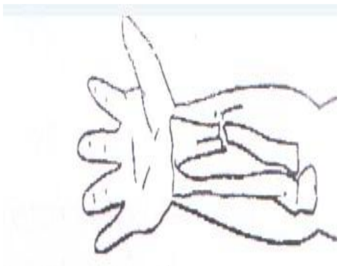

৪. গ্রীন স্টিক (Green Stick) হাড় ভাংগা ঃ- আঘাতের কারণে অনেক সময় বাচ্চাদের হাড় মচকে যায়। এটাকেই গ্রীন স্টিক Green Stick বলে।

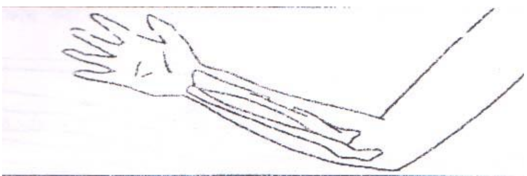

হাড় ভাংগার (Fracture) লক্ষণ ও চিহ্ন ঃ

১. ভাংগা অংশটিতে ব্যথা হবে। বিশেষ করে নাড়াচাড়া করার সময় বেশী ব্যথা হবে।
২. ভাংগা স্থানে হালকা করে চাপ দিলেও প্রচন্ড ব্যথা অনুভব হবে।
৩. ভাংগা স্থানটি ঘেমে যাবে, ফুলে যাবে এবং আকৃতির পরিবর্তন হবে।

যদি কোন ব্যাক্তির শরীরের উপরের লক্ষণগুলি বা চিহ্নের একটি বা সবগুলি দেখা যায় তবে বুঝতে হবে তার হাড় ভেংগে গেছে।

হাড় ভাংগার প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

হাড় ভাংগার প্রাথমিক চিকিৎসা হলো ভাংগা অঙ্গটি চটি (Splint) বা স্লিং (Sling) এর সাহায্যে সাময়িকভাবে নাড়াচড়া বন্ধ করা এবং আহত ব্যক্তিকে ডাক্তার বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

হাড় ভেংগে গেলে তার যত্ন ঃ-

যখন কোন হাড় ভেঙ্গে যায় তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে রাখা। এটা করা হলে তা অধিক ক্ষতি রোধ করে এবং সেরে ওঠার জন্য সহায়ক হয়।

একটি স্প্লিন্ট বা বন্ধফলক তৈরী করুন এবং সম্ভব হলে ভাংগা জায়গাটি স্বাভাবিক অবস্থায় এনে এমনভাবে রাখুন যেন ভাংগা জায়গার উপরের অস্থি এবং নিচের অস্থি নাড়াচাড়া না করে। স্প্লিন্ট তৈরীর জন্য যে কোন জিনিস ব্যবহার করা যায়, যেমন: ২ টুকরা কাঠ অথবা লাঠি।

নিকটস্থ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অথবা জেলা হাসপাতালে পাঠান। যেখানে স্থায়ী প্লাষ্টার তৈরী করা যেতে পারে।

হাড় ভেংগে গেলে অথবা ভেংগে গিয়েছে মনে হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো হাড়টি যথাস্থানে রাখা। রোগীর ব্যথা কমানোর জন্য ট্যাবলেট ডাইক্লোফেনাক Diclofenac ভরা পেটে দেয়া।

পাঠ-১৯
খিচুঁনী

যদি কোন কারনে শরীরে কম্পন ও ঝাকুনী শুরু হয় এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, তাকে খিচুঁনী বা Convulsion বলে।

কারণ ঃ

- ✓ মৃগী রোগী
- ✓ মেনিনজাইটিস
- ✓ সেপটিসেমিয়া
- ✓ ব্রেইন টিউমার
- ✓ মস্তিস্কের আঘাত
- ✓ টিটেনাস
- ✓ ম্যালেরিয়া
- ✓ ষ্টোক
- ✓ ডায়াবেটিস
- ✓ কিডনির সমস্যা
- ✓ লিভার-এর সমস্যা

লক্ষণ ও উপসর্গ ঃ

১. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রবল ঝাকুনিসহ কাপঁতে থাকে

২. শরীর শক্ত হয়ে যায়

৩. দাঁতে দাঁত লেগে যায়

৪. মুখ দিয়ে লালা পড়ে

৫. রোগী মলমূত্র ত্যাগ করতে ও পারে

৬. রোগের তীব্রতা অনুযায়ী খিচুঁনী ৫-১০ মিনিট থেকে শুরু করে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে।

জটিলতা ঃ-

১. মস্তিস্কের ক্ষতি হয়

২. শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি এবং মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

৩. ধীরে ধীরে এ থেকে মৃগীরোগ হতে পারে।

৪. গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভপাত হতে পারে, মৃত বাচ্চা প্রসব করতে পারে, এমন কি মায়ের মৃত্যু ও হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ

খিচুঁনী যেহেতু বিভিন্ন রোগের কারণে হয় তাই রোগটির উপযুক্ত চিকিৎসা করার সাথে সাথে খিচুঁনী ও সেরে যায়। তবে খিচুঁনী অবশ্যই একটি মারাত্মক উপসর্গ বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে। হাসপাতালে পাঠানোর পূর্বে নিচে বর্ণিত কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া উচিৎ

✓ আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই পানি, আগুন এবং মেশিনের কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।

✓ শিশুর জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল খাওয়াতে হবে।

✓ রোগীকে বাম পাশ করে শোয়াতে হবে।

✓ রোগীর শ্বাসনালী পরিস্কার করে দিতে হবে।

✓ জিহবা যেন পিছনের দিকে উল্টে না যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

✓ রোগীর জিহবা বা ঠোট যেন কামড় না লাগে বা দাঁতে দাঁত লেগে না যায় সে জন্য পরিষ্কার কাপড় বা রুমাল দাঁতের নিচে দিতে হবে।

✓ হাসপাতাল বা ক্লিনিক দূরে হলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের ইনজেকশন মাত্রা অনুযায়ী দিতে হবে।

পাঠ-২০

অজ্ঞান বা মূর্চ্ছা

কোন ব্যাক্তি যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এই অবস্থাকে অজ্ঞান বা মূর্চ্ছা যাওয়া বলা হয়।

অজ্ঞান বা মূর্চ্ছা যাওয়ার কারনসমূহ ঃ

- ✓ মারাত্মক মানসিক আঘাত পেলে
- ✓ হঠাৎ মারাত্মক মাথায় আঘাত পেলে
- ✓ হঠাৎ মারাত্মক ব্যথা পেলে
- ✓ অত্যাধিক রক্তপাত হলে
- ✓ মৃগী রোগ হলে
- ✓ রক্তচাপ মারাত্মক ভাবে কমে গেলে
- ✓ খুব মারাত্মক উচ্চ রক্তচাপ হলে
- ✓ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে
- ✓ লিভার অকেজো হলে
- ✓ অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ সেবন করলে
- ✓ বিষক্রিয়া হলে
- ✓ মদ পানের জন্য
- ✓ অনেক্ষন না খেয়ে থাকলে
- ✓ ডায়াবেটিক কমা
- ✓ টিটেনাস
- ✓ একলাম্পশিয়া

কোন ব্যাক্তি মুর্চ্ছা গেলে ঃ

১. ব্যক্তিকে শুইয়ে দিতে হবে এবং তার পা উঁচু করে দিতে হবে।

২. শরীরের পোষাকের বাধন আলগা করে দিতে হবে।

৩. মুক্ত বাতাস নিশ্চিত করতে হবে।

৪. জ্ঞান ফিরে আসলে রোগীকে ধীরে ধীরে বসতে সাহায্য করতে হবে।

৫. তার শারীরিক অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। তাকে সান্তনা দিয়ে আশ্বস্থ করতে হবে।

অজ্ঞান ব্যাক্তিকে পর্যবেক্ষণ ঃ

১. ব্যাক্তিটির বুক উঠানামা করছে কি না দেখুন

২. নাকের কাছে কান নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনুন

৩. ব্যাক্তিটির নাক ও মুখের ফাকে গাল পেতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে কিনা বোঝার চেষ্টা করুন।

মনে রাখতে হবে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকলে ABC পদ্ধতিতে অতি দ্রুত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ও কার্ডিয়াক ম্যাসেজ দিয়ে রোগীকে রিসাসিটেট করতে হবে, রিসাসিটেট করার সময় যে জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে-

✓ জিহবা হাতের আঙ্গুল দিয়ে সামনে টেনে দিন যাতে শ্বাসনালী জিহবায় আটকে না যায়।

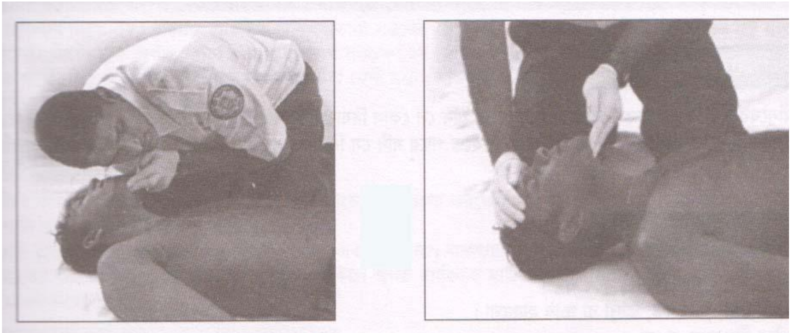

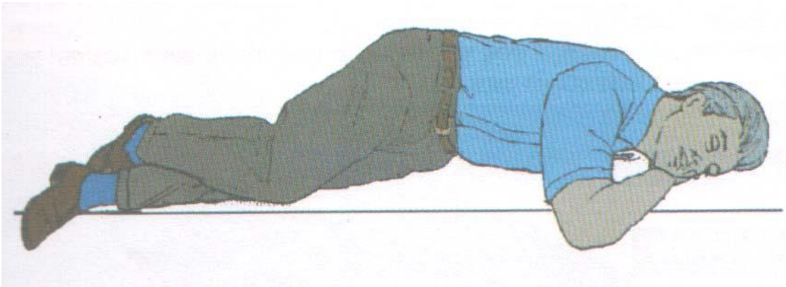

- ✓ A= Airway Clear অর্থাৎ শ্বাসনালী পরিষ্কার করা
- ✓ B= Breathing অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক ভাবে হচ্ছে কি না দেখা
- ✓ C= Circulation অর্থাৎ নাড়ীর গতি পরীক্ষা চালাচল ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা দেখা।
- ✓ যদি প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় পরিষ্কার কাপড় দিয়ে সেই জায়গা চেপে ধরে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

✓ জিহবা হাতের আঙ্গুল দিয়ে সামনে টেনে দিন যাতে শ্বাসনালী জিহবায় আটকে না যায়।

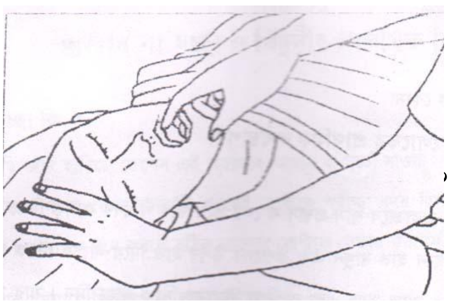

✓ চোখের মনি পরীক্ষা করুন

✓ নাড়ী ও রক্তচাপ পরীক্ষা করুন

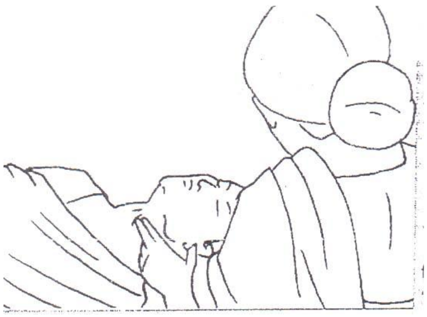

✓ মাথায় কোন আঘাতের লক্ষণ আছে কিনা দেখুন

✓ এক দিকে কাত করে শোয়ার পজিশন

✓ বুক উঠা-নামা দেখা

✓ হৃদপিন্ডের উপর চাপ দিয়ে মুখে ১টি ফুঁ দিতে থাকুন।

পাঠ-২১
ব্যথা

ব্যথা হল এমন এক ধরণের অস্বস্থিকর অনুভূতি যা মানুষ অনুভব করে। ইহা সত্যিকারের হতে পারে অথবা অনুভূতির কারণেও হতে পারে, যার ফলে শরীরের আবেগ ক্ষয় ক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

বিভিন্ন রোগের উপসর্গ/লক্ষণ হিসেব ব্যথা র উৎপত্তি হতে পারে।

সাধারণত ঃ

- মাথা ব্যথা
- পেটে ব্যথা
- মাংসে ব্যথা
- হাড় ভাংগার ব্যথা
- হাড়ের জোড়ায় ব্যথা

- বুকে ব্যথা
- পিঠে ব্যথা
- ঘাড় ব্যথা

ক. মাথা ব্যথা

মাথা ব্যথার কারণ-

- সর্দি জ্বর
- উদ্বেগজনিত
- দৃষ্টি শক্তির তারতম্য
- সাইনুসাইটিস
- উচ্চ রক্ত চাপ
- মাইগ্রেন
- মস্তিস্কের টিউমার
- সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া
- এনক্যাফালাইটিস
- মেনিনজাইটিস
- আঘাত জনিত
- মানসিক ব্যাধি

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

১. ঔষধের মাধ্যমে

ব্যথা নাশক ঔষধ এসপিরিন, প্যারাসিটামল

২. ঔষধ বিহীন- হিট এবং কোল্ড , শারীরিক থেরাপি, ব্যায়াম, ম্যাসেজ, আকুপাংকচার, মেডিটেশন, আচরণ পরিবর্তন, থেরাপি , যোগ-ব্যায়াম।

৩. গুরুতর কারণে মাথা ব্যথা হলে-

হাসপাতাল ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করতে হবে ।

খ. পেটে ব্যথা

অধিকাংশ পেটে ব্যথা ডায়রিয়া, কোষ্টকাঠিণ্য, কৃমি, পেপটিক আলসার অথবা মাসিকের সাথে সম্পর্কিত এবং এসব ক্ষেত্রে রোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা দেয়া সম্ভব । তবে তীব্র ব্যথা, পেট ফুলে যাওয়া , আকস্মিক ব্যথা এবং ক্রমবর্ধমান পেট ব্যথার ক্ষেত্রে রোগীকে নিকটস্থ হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত।

পেট ব্যথা র কারণ সমূহ ঃ

- ডায়রিয়া
- কোষ্টকাঠিণ্য
- বদহজম
- কৃমি
- পেপটিক আলসার
- মাসিক জনিত
- প্রসাবের নালীতে সংক্রমণ
- অন্ত্রের যেকোন স্থানে ছিদ্র
- পিত্তথলির পাথর
- মূত্রথলি ও নালীতে পাথর
- এপিনডিসাইটিস
- মেয়েদের ডিম্বাশয়ে সংক্রমণ বা সিস্ট
- গর্ভজনিত

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রদান ঃ

- ডায়রিয়া- খাবার স্যালাইনসহ অন্যান্য তরল খাবার খেতে বলতে হবে (স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি)। রক্ত আমাশয় হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে / হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- কোষ্ঠকাঠিণ্য-- ইসবগুলের ভূসি. শাক-সবজি , বেলের শরবত ও প্রচুর পানি পান করার পরামর্শ দিতে হবে।
- কৃমি- বয়সানুপাতে মাত্রানুযায়ী কৃমির ঔষধ প্রদান করতে হবে।
- পেপটিক আলসার ও বদহজম- প্রাথমিক পর্যায়ে এন্টাসিড ট্যাবলেট ১-২ টা করে রোজ ৩ বার এবং এন্টিস্পাজমেডিক ট্যাবলেট (১ টা করে রোজ ২/৩ বার খেতে দিতে হবে) । প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ করা যেতে পারে । এন্টি-আলসারেন্ট ট্যাবলেট ১ টা করে ১২ ঘন্টা পরপর দিতে হবে।
- মাসিক জনিত ব্যথা - বুটাপেন বড়ি ১ বড়ি দিনে ৩ বার করে দিতে হবে।

গ. পিঠে ব্যথা

_কারণ ঃ

- ব্যায়াম বা শারিরীক কাজ করা
- ভারী জিনিস বহন বা উত্তোলন করা
- আঘাত জনিত

- বেকায়দা ভাবে শরীরের অবস্থান
- মেরুদন্ডের হাড়ের সমস্যা

উপশমের পরামর্শ ঃ

- রোগীকে শক্ত বিছানায় ঘুমাতে পরামর্শ দিতে হবে
- ভারী জিনিস উত্তোলন/ বহন নিষেধ করতে হবে
- শরীরের বেকায়দা অবস্থানে শোয়া/ বসা পরিহার করতে হবে
- ব্যথা উপশমের জন্য বয়স অনুযায়ী মাত্রানুসারে ট্যাবলেট প্যারাসিটামল / এসপিরিন/ আইবুপ্রফেন ভরা পেটে দিতে হবে
- অবস্থার উন্নতি না হলে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

ঘ. ঘাড় ব্যথা

কারণ ঃ

- অনেক্ষণ যাবৎ মাথা ও ঘাড় একই অবস্থানে রেখে কাজ করা
- মাথায় বা ঘাড়ে আঘাত পওয়া
- বার্ধ্যক্য জনিত হাড়ের ক্ষয়
- বেকায়দা ভাবে শোয়া
- ভারী কিছু মাথায় নিয়ে বহন করা
- উচ্চ রক্তচাপ
- ঘাড়ের হারের স্থান

উপশমের পরামর্শ ঃ

- কাজ করার সময় ও শয্যা গ্রহণের সময় বেকায়দা অবস্থান পরিহার করতে হবে।
- ব্যথা কমানোর জন্য বয়স ও মাত্রানুযায়ী ট্যাবলেট প্যারাসিটামল বা এসপিরিন খেতে দিতে হবে।
- উচ্চ রক্ত চাপ কিংবা বার্ধক্য জনিত কারণে ঘাড়ে ব্যথা হলে রোগীকে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।